Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 149-162
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বর্ধমান জেলার কোলিয়ারি শ্রমিক সংগ্রাম : একটি পর্যালোচনা

সঞ্জীবন মহলদার
সহকারী অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The extensive area of Asansol and Durgapur is often considered as the coal mining regions of Burdwan district. In the Colonial regime of India, these evolved a particular social class who were known as the working class. This working class which mostly comprised of Bauris, Nunias, Chamars, Koris, Bhiyas, Ghatwals, Turi, Teli, Jolaha, Kahar, Kalwar, Dosadhs were the most important. All miners started working in these mines in lieu of very low wages. Right from the beginning, both the local and the migrated workers were constantly and consistently exploited and this gradually gave rise to defiance and rebellions amongst them. This rebellions activities of the working classes were very much discernible even during the non-cooperation movement. Names like Bankim Mukherjee and then Bijoy Paul became pioneering landmarks in the history of Trade Union Movements in Asansol. Deben Sen was yet another reactionary whose able leadership was instrumental in moulding the coal miners rebellion afresh and contributed largely to its proper growth. The anger and discontent of the coal miners was greatly invigoratated and instigated by the fact that despite constant protests. The Coal-miners were still under the brunt of exploitation even after independence. This anger and contempt of the workers was shaped responsibly by the trade union—AITUN, INTUC, CITU, Hind Mazdoor Sabha. The present researcher intends to investigate the various hues and aspects of this organized movement under the responsible direction of the Trade Union; viz., the origin of the movement, its causes, the owner-labourer relationship, the socio-economic and political consciousness of the workers, the spirit and fervour of the rebellion, the relation between the Govt. and the owners of Coal mines, and the analysis of the role of the trade unions in organizing these movements.

Keywords: Coal mines, working class, oppression, protest, trade union.

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক শিল্পায়নের সূত্রপাত। তার ফলে নতুন একটি সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যারা শ্রম বিক্রি করে মজুরির বিনিময়ে, তারা শ্রমিক শ্রেণি হিসাবে পরিচিত। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল। শ্রমিকশ্রেণিও তার বাইরে ছিল না। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এদেশের মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা গড়ে উঠেছিল। তার ফলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণি এই সংগ্রামে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পেশাগত ও বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তারা সামিল হন। তাদের চেতনা যখন আরও অগ্রসর হয়েছে। তখন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবি আদায়ের জন্য শ্রেণি কর্তৃক শ্রেণিশোষণের অবসানের কর্মসূচি তারা গ্রহণ করেছে। বৃহৎ যন্ত্রচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন সেই শোষণকে আরও তীব্র করে তুলেছে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে সেই শোষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে, ভারত স্বাধীন হলেও শ্রমিকশ্রেণির পরাধীনতা (মালিকশ্রেণির কাছে) অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি শ্রমিকদের আন্দোলন শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথপ্রদর্শক বলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখন প্রশ্ন হল বর্ধমান তথা আসানসোলের কয়লা খনির শ্রমিকরা কীভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সচেতন হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির শ্রমিক সংগঠন এ-বিষয়ে কী ভূমিকা পালন করেছিল?

ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন এবং তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন, শুধু যে প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে ওঠে তা নয়, এটা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্যও বটে। লেনিনের ভাষায়— "ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ইহাই নয়, শিল্প শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহাসিকভাবেও অনিবার্য...।"[১] 'স্কুল অব কমিউনিজম' যে মূল ধারণাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা চারটি মৌলিক সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ— (১) ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে এমন সংগঠন, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করবে (২) ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করবে (৩) ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির সাথে শ্রমিকশ্রেণির যোগাযোগা সাধন করবে। (৪) সর্বহারা বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।[২]

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই শ্রমিকশ্রণির জন্ম হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে শিল্প বিপ্লবের কোনো সুযোগ হয়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বিধ্বস্ত ও সংকটাকীর্ণ। পরাধীন ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে শ্রমিকশ্রেণির বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অংশ হিসাবেই দেখা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণিকে বাদ দিয়ে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণির জন্মলগ্ন থেকে সার্বিক সংগ্রামের (শ্রমিক সংঘ ও রাজনৈতিক) প্রামাণ্য ধারাবাহিক এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস যথাযথভাবে রচিত হয়নি।[৩]

ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণির ক্ষেত্রে শোষণের মূলত দুটি রূপ ছিল। শ্রমিকশ্রেণির সহ সমগ্র ভারতীয় জনগণের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। আবার পাশাপাশি ভারতীয় ও ব্রিটিশ মালিকানাধীন নির্বিশেষে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির ওপর পুঁজিবাদী শোষণ। ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণিকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে। তাই এক অসহনীয় বাস্তব সামাজিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভারতের শ্রমিকশেণি তার শ্রেণি সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও নিজস্ব ভূমিকা দিয়ে অগ্রসর হয়। এই ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণিচেতনা বিকশিত হতে থাকে।[৪] বর্ধমান জেলার কয়লাখনি শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করলে শ্রমিক সচেতনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা পরিস্ফুট হবে।

বর্ধমান জেলায় শিল্পক্ষেত্র হিসাবে কয়লাখনি অঞ্চলগুলি গড়ে উঠেছিল। কয়লার উৎপাদন ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৯,৩০,০০০ টন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হয় ৬৫,০০,০০০ টন। ক্রমশ আবিষ্কৃত ও কার্যকর খনির সংখ্যা ও শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১১ সালে জেলায় মোট কয়লাখনির সংখ্যা ছিল ১২০টি, শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩৭,৭০৭।[৫] ১৯১৫ সালে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫১,৪৪৭ জন। ওই সময়ে প্রতি ১০ জন পুরুষ পিছু নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫.৬ জন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩,০০০, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৩১,০০ এবং

১৯৪৪ সালে ৬১,০৫৫ জন।[৬] ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রানিগঞ্জ আসানসোল শ্রমিকদের মধ্যে বাউরি ও সাঁওতালদের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে পাসি, লোধ, কুরমি, আহির, জামার সম্প্রদায়ের মানুষজন শল্পশ্রমিক হিসাবে যোগদান করে।[৭] নিঃস্ব কৃষক, খেত-মজুর, শহুরে রকমারি কাজে নিযুক্ত মজুর, বনাঞ্চল থেকে বিতাড়িত আদিবাসী বা ট্রাইবাল সমাজ ও অর্থনীতিতে অবহেলিত ও প্রান্তিক হয়ে পড়া ইত্যাদি নানা স্তরের থেকে।[৮] দীপেশ চক্রবর্তী যে কৃষকসমাজের কথা লিখেছেন সে সমাজও ভেদাভেদহীন ছিল না।[৯] এইসব মানুষরা কয়লাখনি অঞ্চলে এসেছিল ক্ষুধা-দারিদ্র, ঋণ-পরিশোধ, রোগ থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে। দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাদের এই আগমন। কিছু ঔপনিবেশিক শাসনে দেশি বিদেশি মালিকদের নির্মম শোষণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের শ্রম শক্তিই পণ্য। স্বল্পমূল্যে সর্বাধিক শ্রমশক্তি শোষিত হয় কয়লাখনি শিল্পে। তাই বহিরাগত দৈহিক বলশালী, অগ্রণী চিন্তা-চেতনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বা দূরে অবস্থিত ছিল। কয়লাখনি শ্রমিকগণ বিংশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশক পর্যন্ত। কানপুরে শ্রমিকসংগঠনের দক্ষতা অর্জনকারী বিজয় পাল আসানসোলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কয়লাখনি শ্রমিকদের সংগঠন বিস্তারলাভ করে। খনি মালিকগণ খুবই স্বল্প বেতন দিয়ে শ্রমিকশোষণ করত। পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কোলফিল্ডের নাম—রানিগঞ্জ।[১০]

মাইনার্স—আন্ডার গ্রাউন্ড

১৯২৯ ডিসেম্বর			১৯৩৯ ডিসেম্বর			১৯৪২ ডিসেম্বর		
টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা
০	১৩	০	০	৯	০	০	১১	৯

তথ্যসূত্র : *বসুরায়, সুনীল, রানীগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিক, মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৭*

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মজুরি সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিক মাসে ১৫ টাকা উপার্জন করত। অধিকাংশ শ্রমিক মাসে ১০ টাকা বা তার কম আয় করে। প্রচুর অদক্ষ শ্রমিক ৬ আনা ও শিশু শ্রমিক ৪ আনা উপার্জন করত।[১১] শ্রমিকদের মজুরি নিতে হতো সর্দারদের কাছ থেকে বা গ্যাংম্যান বা ঠিকাদারের কর্মচারীদের কাছ থেকে। নারী ও শিশু শ্রমিকদের একইভাবে কাজ করতে হতো। বিমার সুযোগ ছিল না।[১২]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগে কয়লাখনি শল্পে কোনো আন্দোলন বা সংগঠন গড়ে উঠেছিল কিনা তা চর্চিত বিষয়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে কোনো ইউনিয়ই কয়লাখনি শিল্পে সক্রিয় ছিল না। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কমিউনিস্ট বন্দিরা তাদের জবানবন্দিতে (কমিউনিস্ট চ্যালেঞ্জ ইমপিরিয়ালিজম ফ্রম দ্য ডক) বলেছিলেন—"১৯১৮-২২ বছরগুলিতে অনেক সংগ্রাম হয়েছিল, কিন্তু বাইরের শ্রমিকনেতারা যারা এসবের মধ্যে নিজেদের জড়িত করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে শ্রমিকদের খুব খারাপ ধারণা হয়েছিল। ওই সময়ের শেষের দিকে তাই তাদের আর কোন প্রভাব ছিল না। মেলিকদের আক্রমণ বাড়ল, শ্রমিকরা তার বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিরোধ গড়ে তুললো, তারা ১৯২৪-২৯ ওই ছ-বছর চারটি দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ ধর্মঘট করেছিল। এর প্রথমটি হয় ১৯২৪ সালে। সংস্কারবাদীরা তার পরে আবার জড়ো হল এবং কাজ সংগঠিত করতে শুরু করল। তার ফলে ১৯২৫ সালে যে ধর্মঘটে তারা রিলিফ বিতরণে সাহায্য করেছিল। ইউনিয়ন অবশ্য কখনই তার সভ্য সংখ্যা ৯০০০-এর বেশি বলে দাবি করেনি। ১৯২৮-এর ধর্মঘটে সম্পূর্ণ অবসান ঘটলো। ওই সময়ে অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতি ও সংস্কারবাদীদের প্রভাব এই পূর্বোক্ত সাধারণ ধারার অনুযায়ী ছিল তারা হল কয়লা শিল্প, মাদ্রাজ কটন শিল্প, বিবিসি আই। ই আই রেলওয়ে এবং জামসেদপুর লৌহ ইস্পাত শিল্প।... যেমনভাবে দেখা যাবে যে কয়লাশিল্পে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের প্রসার ঘটে জামসেদপুর থেকেই।"[১৩]

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব কয়লাশিল্প ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। এই সময় সংগঠিত ধর্মঘটে ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন সমানভাবে আশঙ্কিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালের বাংলায় ১৩৭টি ধর্মঘট হয়েছিল।[১৪] এর মধ্যে ৬টি হয়েছিল রানিগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে— (১) ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারি (২) নুরসুমদা কোলিয়ারি (৩) বারাবনী কোলিয়েরি (বেনিতারা কোল কোং লিঃ) (৪) সাতপুখুরিয়া কোলিয়ারি। এইসব ধর্মঘটের দাবি ছিল উচ্চ মজুরি। এই ধর্মঘটের মধ্যে চারটি আংশিক সাফল্য অর্জন করে—একটি মীমাংসা হয়, একটি ব্যর্থ হয়। সরকারি রিপোর্টে স্বীকার করা হয় যে খাদ্য, বস্ত্র এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিণতিতে সকল শ্রেণির শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির পরিণতিতে সকল শ্রেণির শ্রমিকদেরই মজুরি বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। প্রকৃত দুঃখকষ্ট নিঃশ্রয় বেড়েছে। যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।[১৫] তবে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বদান এবং অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মূল লক্ষ্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা ছিল না। আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মূলত ইউরোপীয় মালিকানাধীন কোলিয়ারিতে।[১৬] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দর্শনানন্দ-এর নেতৃত্বে অ্যান্ডু উইল কোম্পানির ৬টি খনিতে, ইক্যুটেবল কোম্পানির ৪টি খনিতে সংগঠিত ধর্মঘটে প্রায় ৫৩০০ খনি শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। জামুরিয়াতে এক সভায় তিনি ধনী ও গরিবদের মধ্যে সাম্যতার 'বলশেভিক নীতি' তুলে ধরেছিলেন। দ্বিতীয়বার জামুরিয়াতে তিনি ৫০০০ হাজার শ্রমিককে সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্দেশ্য রক্ষা করে ইউরোপীয় মালিকাধীন খনিতে কাজ বন্ধ করে ভারতীয় মালিকানাধীন খনিগুলিতে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।[১৭] ১৯১২ সালে দর্শনানন্দ কর্তৃক তহবিল আত্মসাৎ করার জন্য রানিগঞ্জ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভেঙে পড়েছিল।[১৮]

কয়লাখনিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র রানিগঞ্জে এসেছিলেন। শ্রমিকস্বার্থে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়।[১৯] রানিগঞ্জ কয়লাখনি এলাকায় এই সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ওই সময়ে গঠিত হয় 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। নেহরুর নেতৃত্বে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ও কোলিয়ারি শ্রমিকরা উৎসাহিত হয়। ১৯২৪ সালে পি.সি. বসু এই সংগঠনের সর্বসময়ের জন্য বেতনভুক সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হল—(১) শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব ও অভিযোগ দূরীকরণ (২) ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া আদায়ের জন্য মামলা-মোকদ্দমা (৩) প্রয়োজনে ধর্মঘট (৪) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষাদান।[২০]

খনি সমূহের প্রধান পরিদর্শকের রিপোর্টে তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের পরিচয় পাওয়া যায়—(১) দ্য ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি লেবার ইউনিয়ন : ১৯২৬-এর ট্রেড ইউনিয়ন আইন বলে রেজিস্ট্রিকৃত। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ও ঝরিয়া কয়লাখনি সমূহের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এর সদস্য সংখ্যা মার্চে ছিল ৮৫৬। (৩) দ্য ইন্ডিয়ান মাইনস অ্যাসোসিয়েশন, ১৯২৬-এর ট্রেড ইউনিয়ন আইন বলে রেজিস্ট্রিকৃত সদর দপ্তর ছিল ঝরিয়া, সদস্যসংখ্যা ছিল ৪২৯৭। কল্যাণমূলক কাজ যেমন মজুরি ও বেতন, মালকাটারদের পানাভ্যাস দূর করা, ক্ষতিপূরণ, বেতন সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন আগ্রহ দেখাত।[২১]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ঝরিয়ায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু 'টাটা কোলিয়ারিজ লেবার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।[২২] 'ইন্ডিয়ান কোলিয়ারিজ অ্যাসোসিয়েশন' ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি লেবার ইউনিয়ন' নাম গ্রহণ করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তা ভেঙে যায় ও শ্রমিকদের একাংশ 'ইন্ডিয়ান মাইনস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

১৯৩০ সালে গড়ে ওঠা 'টাটা কোলিয়ারিজ লেবার অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রভাব এই অঞ্চলে পড়েছিল। তাই বলা যায় খনি অঞ্চলে শ্রমিকগণ কৃষি শ্রমিক থেকে শিল্প শ্রমিকে উত্তরণ ঘটিয়ে ও নিজেরা শোষণ থেকে মুক্ত নয়নি। পুঞ্জিত অসন্তোষ সঠিক মতাদর্শের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।[২৩] অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত স্তর অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক দল শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব দলের স্বারা পরিচালিত হয়ে সংগঠনের সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন অভিমুখ তৈরি করে।[২৪]

এসত্ত্বেও কয়েকটি সমস্যা ও বাধার জন্য সংগঠিত আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার কারণগুলি ছিল (১) কয়লা খনির শ্রমিকদের মধ্যে ভূমিপুত্র (Son of the Soil) ভাবনার প্রাবল্য (২) অশিক্ষা ও দুর্নীতি জড়িত রাজনীতি (৩) অধিকাংশ ভিন্ন ভাষাভাষি শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব (৪) মূল্যবোধগত অবক্ষয় ও আন্দোলনের বিমুখতা (৫) যোগ্য দক্ষ নেতা ও কর্মী অভাব (৬) শ্রমিকদের পানাভ্যাস, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতার অভাব।[২৫]

জেলাশহর বর্ধমেন এবং স্থানীয় কংগ্রেস দল থেকেও শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় কোনো উৎসাহ প্রথম দিকে দেখা যায়নি।[২৬] ১৯৩৬ সালের আসানসোলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে কমিউনিস্টরা লেবার পার্টি ও কংগ্রেসের মঞ্চ ব্যবহার করতে থাকে।[২৭] ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রের শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকদের জন্য সংগঠিত কয়েকটি বিশেষ শ্রমিক কেন্দ্র ছিল। এরই শকটি আসানসোল কোলিয়ারি শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। এই কেন্দ্রে কমরেড কনক মুখার্জিকে প্রার্থী করা হয়। এই সূত্রে মজ্‌ফ্‌ফর আহম্‌দ এবং বঙ্কিম মুখার্জি কংগ্রেস অফিসে আসেন। কলকাতার প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসের শ্রমিককেন্দ্রগুলি সহযোগিতার নীতি গৃহীত হয়েছিল।[২৮] আসানসোল নির্বাচনে কমিউনিস্টরা সফল হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেস টিকিট আসানসোল থেকে বঙ্কিম মুখার্জি জয়লাভ করেন। কংগ্রেস শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপারে উৎসাহ না দেখানোয় কাগজকল ও রানিগঞ্জ শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকরা অমূল্য ঘোষের কাছে এসে তাদের ইউনিয়ন চালানোর ভার নেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অমূল্য ঘোষ নিত্যানন্দ চৌধুরীর (শ্রমিক নেতা) সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেন।[২৯] নিত্যানন্দ চৌধুরীকে আসানসোলের শ্রমিকদের মধ্যে ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছিল। তবে ইতিপূর্বে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ইউনাইটেড ফ্রন্টনীতি যা ভাট ব্রাডলে থিসিস বলে অধিক পরিচিত। ঘোষণা করলে অবস্থা আরও নমনীয় হয়। বিভিন্ন সম-মনোভাবাপন্ন দলগুলি পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসে। পার্টি বেআইনি হওয়ার পরে সরকার নানা অজুহাতে কমিউনিস্টদের ধরপাকড় শুরু করে এবং তাদের জেলে তৃতীয় শ্রেণির বন্দি হিসাবে গণ্য করা হতো। আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জি প্রমুখের সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের বাণী প্রচার করার অপরাধে নিত্যানন্দ চৌধুরী ও ১৯৩৬ সালে তৃতীয়বার হাজতবাস করেছিল। হাজতে অকথ্য অত্যাচারের মধ্যেও এবং পুলিশের সবরকম নিষেধ অগ্রান্য করে শ্রীচৌধুরী শ্রমিকের গান গাইতেন।[৩০] কয়লাখনি অঞ্চলে কমিউনিস্ট কর্মীদের নির্বাচনে প্রচার করা খুবই অসুবিধাজনক ছিল। তারা নির্বাচনী সমাবেশের আয়োজন করলেই মালিকপক্ষ তা ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যা খেউড় ও খেমটা গানের আয়োজন করত বা অন্যভাবে কমিউনিস্টদের সমাবেশকে ভণ্ডুল করার চেষ্টা করত। প্রতিটি সমাবেশের শুরুতে নিত্যানন্দ চৌধুরি পালটা ব্যবস্থা হিসাবে রুচিপূর্ণ হিন্দি গান এবং গণসংগীত গেয়ে শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় শেষপর্যন্ত মালিকপক্ষের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই নির্বাচনে শুধুমাত্র বঙ্কিম মুখার্জির জয় হয়েছিল তাই নয়, অপ-সংস্কৃতিকে দূর করার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির যে ব্যবহার এতে স্থানীয় যুবমানসে দাগ কেটেছিল। তাদের একটা বড় অংশ পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্টরা কয়লা শ্রমিকদের সংগঠিত করতে গেলে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৩৮ সালে বিনয় চৌধুরী, নিত্যানন্দ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোলের কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন।[৩১]

বঙ্কিম মুখার্জি জয়লাভ করার পর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মতো বেশ কিছু যোগাযোগ তৈরি হল এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের অভাবে আসানসোলে শিল্প এবং কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনেক পীড়ন সহ্য করতে হতো। সংগঠনের প্রচার অভিযানে সুপ্ত শক্তি জাগরিত হল এবং বিক্ষোভের সাংগঠনিক রূপ দেখা দিতে শুরু করল। এই নির্বাচনের সময় আসানসোল মহকুমা কারখানা ও খনি আদিতে যেটুকু শ্রমিক সংগঠনের ভাসাভাসা অস্তিত্ব ছিল তা হল জামসেদপুর টাটা লোহা ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের ওপর যারা নেতৃত্বদান করতেন তাদেরই। তাদের নেতা ছিল হোমি।[৩২] পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালের শেষ ও ১৯৪১ সালের গোড়ার বিজয় পাল বর্ধমান জেলায় এসে পার্টির কাজে যোগদান করান। মানবেড়িয়া কোলিয়ারি অফিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কোলিয়ারির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করেন।[৩৩] শিবপ্রসাদ দত্ত তখন কোলিয়ারি ওয়ার্য়ার্স ইউনিয়নের কাজ করেন ও বরাকরে থাকেন। কোলিয়ারি এলাকায় পরপর কয়েকটি জায়গায় তিনি কাজ করান, শেষ ছিলেন জামুরিয়াতে।[৩৪]

১৯৪০-এর দশকে এই সময়টা কোলিয়ারি শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হল। কোলিয়ারিতে যেসব স্থানে ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল সেগুলি হল— (১) বাকুসুমুলিয়া (২) শ্রীপুর (৩) জামুড়িয়া গ্রুপ, দিসেরগড় (৪) লালবাজার (৫) বালতোলিয়া কোলিয়ারি।[৩৫] কাজোড়া কোলিয়ারিতে ছোরা গ্রামকে কেন্দ্র করে একটা এলাকার দায়িত্বে ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। বিরোধী কংগ্রেস নেতৃত্ব হরেকৃষ্ণ কোঙার সহ কিছু কর্মী ভীষণভাবে আক্রান্ত হন।[৩৬] কিন্তু তখনও অর্থাৎ পাঁচের দশকে কয়লাখনিগুলিতে সেভাবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিল করা যায়নি। এই সময়ে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় শ-তিনেক মতো কোলিয়ারি ছিল।[৩৭]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস অধ্যাপক আব্দুল বারিকে কয়লাখনি শ্রনিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরির জন্য পাঠায়। প্রধানত বিহারের মুনিডি, ভদ্রচক, কাতরাস, চইটাডিহি, কুস্তোড় কোলিয়ারিতে ধর্মঘট হয়। কুস্তোড় কোলিয়ারির ধর্মঘট ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ২২ দিন, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১০০ দিন, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ১০০ দেন স্থায়ী ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে কংগ্রেস দেবেন সেনকে প্রার্থী করে। তিনি নির্বাচিত হন। এই সময় থেকেই কংগ্রেস সংগঠিতভাবে কোলিয়ারি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরি করে।[৩৮]

স্বাধীনতা লাভের পরে কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ায়। কিন্তু কংগ্রেসে জমিদার, খনি মালিক ও তাদের প্রতিনিধিরা নেতৃত্বে আসতে থাকে। ইংরেজ কয়লা খনি মালিকরা তাদের সমর্থন করতে থাকেন। ফলে রানিগঞ্জ, ঝড়িয়া কয়লাখনি অঞ্চলে কমিউনিস্ট সংগঠিতভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। বীরেন নাগ, বিজয় পাল প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পরে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মতভাবে কাজ করার অধিকার লাভ করে এবং এই সময় থেকেই কয়লখনি শ্রমিকদের মধ্যে 'শ্রমিক সংঘ আন্দোলন' দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে।[৩৯]

কংগ্রেসের শাখা সংগঠন হিসাবে একসময় এ.আই.টি.ইউ.সি গঠিত হয় এবং তারই হাত ধরে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মাইনস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন'। কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন হিসাবে এ.আই.টি.ইউ.সি-ভুক্ত খনি শ্রমিক ইউনিয়গুলি সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান মাইন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' যার প্রধান কার্যালয় ধানবাদে অবস্থিত ছিল।[৪০]

পরবর্তীকালে কংগ্রেস শ্রমিকদের মধ্যে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তার অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালে ৬ অক্টোবর স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে মহম্মদ আব্দুল সাত্তারের সভাপতিত্বে আসানসোল কোলিয়ারি মজদুর সংঘের সভা হয়। এই সভায় দেবেন সেন, মজদুর কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীজগদীশ পাণ্ডে, কোষাধ্যক্ষ শ্রীজয়নারায়ণ শর্মা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইউনিয়নের হিসাব পেশ করলে দেখা যায় মজদুর কংগ্রেসের মোট আয়ের চেয়ে ১৫০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। আর এর জন্য পরস্পর পরস্পরের ওপর

দোষারোপ শুরু করে। এই সভার পর দেবেন সেন ও সাত্তার সাহেব নিজ নিজ দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভা করেন। দেবেন সেন মজদুর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা পালটা মজদুর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সাত্তার সাহেবের সভায় গৃহীত হয়।[৪১] পরবর্তীকালে দেবেন সেন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক দল' গঠন করে, পরে 'হিন্দ মজদুর সভা' গঠিত হয় এবং আরো পরবর্তীকালে 'সারা ভারত খনি মজদুর ফেডারেশন' গঠিত হয়।[৪২] কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পেছনে দলের বিভিন্ন নেতার ক্ষমতা অর্জনের লড়াই-এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিধাও বর্তমান ছিল। ১৯৪৮ সালে এ.আই.টি.ইউ.সি ভেঙে আই.এন.টি.ইউ.সি গঠিত হয়।[৪৩]

সমাজতন্ত্রীরা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে 'হিন্দ মজদুর সভা' গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে তিন দিনের অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ওই অধিবেশনেই নতুন সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে 'নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত আর এস রুইকর। উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর এ খিদগীকর, সি এ পিল্লাই, এ এস উইলিয়াম, এন ভি ভাডকে, বিশ্বনাথ দুবে, রজনী মুখার্জী, শিবনাথ ব্যানার্জী, বিনায়ক কুলকার্নি, পরিতোষ ব্যানার্জী।[৪৪] ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল কলকাতা কনফারেন্সে যৌথ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।[৪৫] কমিউনিস্ট পরিচালিত বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকার উদ্যোগ যে যে নতুন অভ্যন্তরীণ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে তাতে হিন্দ মজদুর সভাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই-এ সভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছিল।[৪৬] তবে 'হিন্দ মজদুর সভা' সোস্যালিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।[৪৭]

স্বাধীনতার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ২০ মার্চ বেঙ্গল কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি বিজয় পাল বাংলার কয়লা শিল্পের শ্রম বিভাগের সেক্রেটারিকে এক চিঠিতে কোল আইন তৈরির পূর্বে তাদের দাবিগুলি পর্যালোচনার দাবি করেছিলেন।[৪৮] (১) জীবনযাপনের জন্য অতিরিক্ত খরচ ও কাজের ঝুঁকির জন্য তাদের মজুরি ৬০ টাকা প্রতি মাসে হওয়া উচিত। তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মযোগ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। (২) বাৎসরিক বোনাস হিসেবে চার মাসের বোনাস দেওয়া উচিত। উৎপাদন ও অতিরিক্ত উৎপাদন বোনাস শ্রমিকদের প্রাপ্য। (৩) কোলিয়ারির নিযুক্ত সকলকে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দিতে হয়ে। (৪) শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। (৫) ভূ-গর্ভে কাজের পরিবেশকে আরো উন্নত করা দরকার। (৬) নিয়মিত কর্ম নিযুক্তি ও চাকরি ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন; তাদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের স্কিমের মধ্যে আনা উচিত। (৭) শ্রমিকদের ধাওড়া ছিল অস্বাস্থ্যকর ও অবাসযোগ্য স্থলে বাসস্থানগুলিকে বাসযোগ্য করা প্রয়োজন---পরবর্তী পাঁচ বছলে ১-৫ লক্ষ কর্ম সংস্থান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। শ্রমিকদের দুটো ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, পায়খানে, প্রস্রাবখানা, পরিশ্রুত জল-এর ব্যবস্থা করা উচিত। (৮) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক স্তরে হাসপাতাল তৈরির ক্ষেত্রে কোল মাইনস ওয়েলফেয়ার অর্গনাইজেশন-এর কাজ আরো দ্রুত করতে হবে। (৯) শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে হবে ও মাইনরদের শিশু ও সাবালক সন্তানদের গ্রহণযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (১০) রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। (১১) কয়লা উত্তোলনের টবের মাপ নির্দিষ্ট করতে হবে ও নিয়মিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। (১২) নতুন মেশিন প্রয়োগের জন্য শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও টবের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ার ক্ষেত্র ভালোভাবে পর্যালোচনা করে উচিত। (১৩) ছুটির দিনে কাজের দ্বিগুণ বেতন দিতে হবে (১৪) কয়লা খনিতে একদিন সবেতন ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা থাকলেও বছরে একমাস রবিবার বাদে সবেতন ছুটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। (১৫) দিনে আট ঘণ্টা ও সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করতে হবে (১৬) সব ধরনের কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থা ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে বন্ধ করতে হবে। (১৭) বন্দি সকল শ্রমিক ও নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। সমস্ত রকম কেস তাদের ওপর থেকে তুলে নিতে হবে। (১৮) ভারত সরকারের উচিত কয়লা খনি কাজের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ কাজের ব্যাপারে তদারকি করা—যা হবে জাতীয়করণের প্রথম পদক্ষেপ। এর ফলে কয়লা শ্রমিকদের অপচয় বন্ধ হয় এবং বৃহৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পে উন্নতি হবে।

স্বাধীনতা উত্তর সময়কালেও খনিগুলির অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক দেশের মতো ভারত তার অতীত শাসকদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল।[৪৯] সকল কয়লাখনিগুলিতে বিদেশি মালিকদের শোষণের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। সেই কারণেই ১৯৫৪ সালেও কোলিয়ারি শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ছিল দৈনিক ১ টাকা ৪ আনা আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৭৮ পয়সা।[৫০] স্বাধীনতার পরে ত্রৈমাসিক বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রচলিত হলেও অধিকাংশ মালিকরাই এই নিয়ম লঙ্ঘন করতেন। ছয় মাস চাকরির পরে প্রভিডেন্ট ফান্ড না দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রমিক ছাঁটাই করে কিছুদিন পরে তাদের ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে মনোনীত করা হতো। বোনাসের পরিবর্তে লুচি, বোঁদে আর সামান্য কিছু উপহার দেওয়ার কয়লাকুঠির কাহিনি বড় ভয়ঙ্কর—যা নীলকুঠির অত্যাচারকে হার মানায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদের গন্ধ পেলেই মালিকের পোষা গুণ্ডারা রাতের অন্ধকারেই তার শরীর লাশে পরিণত করে দিত। এইসব ঘটনা ঘটত বেলাবাদ, বাবুউশোল, সিশিকেড, সামলা খনি সহ নিউ সাতগ্রাম মডার্ন সাতগ্রাম সহ বিভিন্ন খনিতে।[৫১] তাই 'অনার্য দামোদর' উপন্যাসে অনন্তর কাছে শ্রমিকরা তাদের ভীতি প্রকাশ করেছিল—"একজন বলল—বাবাজী? আমরা ইউনিয়নের কথা জানি। আপনারা কি করতে চান তাও জানি। মনে মনে আপনাদের সাহায্যের তারিফ করি। সমর্থন করি। কিন্তু কি করবো? সরদাররা জানতে পারলে আমাদের জান খতম করে দেবে। বউ বিটির ইজ্জত লুট করে দেবে। দেশে যে ক্ষেতি-বাড়ি আছে তা বেদখল করে বাহ-মাকে ভিক মাঙ্গার দশা বানিয়ে দেবে।"[৫২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা এইসব বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কয়লাখনির কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অনুকূলে জীবন-যাপন নিয়ে ভাববার অবসর কেরো ছিল না। দেবেন সেন এসেছিলেন সেই ভাবনা নিয়ে। প্রজা সোসালিস্ট পার্টির কর্মীর কয়লাকুঠিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা লেগে আছে কিন্তু কুলিকামিনরা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যে একটা প্লাটফর্মে একটা পতাকার নীচে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।[৫৩]

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবণতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত হলেও মালিক ও প্রশাসনের মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে মজদুররা আই এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টি.ইউ.সি, হিন্দু মজদুর সভা প্রভৃতি ভিন্ন মতাদর্শী ট্রেড ইউনিয়ন খনি এলাকার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের তীব্রতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। চিনাকুড়ি কোলিয়ারিতেই মজদুর সভার কার্যালয় বেঙ্গল কোল কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলে।[৫৪] কর্তৃপক্ষ বৈঠক গৃহীত বেতন সংক্রান্ত শর্তের অবমাননা করায় এই ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকদের পাশে আসানসোল কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সেন-র‍্যালে, মিউনিসিপ্যাল মজদুর ইউনিয়ন ও চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে ইউনিয়ন সক্রিয় সমর্থন গড়ে তোলে। এর থেকেই এই অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সংহতি গড়ে ওঠার চিত্র লক্ষিত হয় কিন্তু এই সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়টি ছিল খুব কঠিন। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ঐক্য মালিক শ্রেণির কাছে এতটাই ভীতিপ্রদ ছিল যে তার জন্য খুন, জখম, নারী নির্যাতন, রাহাজানি, চাকরি থেকে বরখাস্ত—কোনো উপায়ই বাদ থাকত না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ম্যানেজার থেকে সর্দার বা আড়কাঠি, গুণ্ডা—সবাইকে কাজে লাগাতো। এইভাবে রানিগঞ্জের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী জগদীশ ঝা সিলেক্ট জামবাদ কোলিয়ারিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার সময় আক্রান্ত হন।[৫৫] খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উপন্যাস 'কালো হীরের দেশে'-র নায়ক জীবন ভট্টাচার্য এভাবেই আক্রান্ত হন সেখানে পুলিশও সক্রিয়ভাবে মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করে।[৫৬] তবে বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে দাবি আদায়ে সমর্থ হন। বাঁক শিমুলিয়া খনিতে নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনরত অগ্রণী শ্রমিক রাধেশ্যাম পাণ্ডেকে ছাঁটাই করার পরেও তিনি খনিতে মজদুরদের

নিরাপত্তার দাবিতে তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁকে কোম্পানির এজেন্ট খনি ছাড়তে আদেশ দিলে শ্রমিকরা তীব্র প্রতিবাদ করে। এর পরে তারা এজেন্টের অসদাচরণের বিরোধিতা করে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে ধর্মঘট করেন ও তাদের দাবি মানতে এজেন্টকে বাধ্য করেন।[৫৭] এইভাবে রানিগঞ্জের পার্শ্বস্থ শীতলদাস কোলিয়ারি ও অমৃতনগর কোলিয়ারিতে মালিকদের জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। কয়লাখনির শ্রমিক ক্রমশ নিজ অধিকারের দাবিতেও অনেক ক্ষেত্রে বাইরে সমস্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের লড়াইয়ে সামিল হন। সেই সূত্রেই বি.টি.পি.ইউ.সি-র নেতৃত্বে সংগঠিত বার্ন শ্রমিকদের সমর্থনে আয়োজিত সভায় মিঠাপুর, তপসী, সিঙ্গারন প্রভৃতি খনির শ্রমিকরা রক্তদান করেন।[৫৮]

তবে খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারেনি। সেই কারণেই রতিবাটী কোলিয়ারিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনিং কোম্পানির দুটি পিটে শ্রমিকদের ওপরে অকারণ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানালে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়।[৫৯] খনি এলাকায় গুণ্ডা দিয়ে শ্রমিকদের দমিয়ে রাখার এই ছবিকেই কালো হীরের দেশের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে যেখানে ঝানু নাগ, জাগুশা প্রমুখ এই ধরনের কাজ করে।[৬০] এ-সবের বিরুদ্ধে, খনি জাতীয়করণের দাবিতে, মজদুরদের সভায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত এ.আই.টি.ইউ.সি-র কলকাতা সম্মেলনে খনি শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়। সম্মেলনের আগে ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে খনি শ্রমিকদের মজুরি ও মহার্ঘভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি করে। শ্রমিকদের দাবিকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়ে এই সময় সারা ভারত কোলিয়ারি ট্রাইবুনাল মালিক অ্যাসোসিয়েশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়।[৬১] শ্রমিকদের এই জয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলে জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার দাবিতে সঙ্গবদ্ধ করে তোলে। কিন্তু খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে আরও বেশি নিপীড়ন শুরু করে। এর ফলে মিঠাপুর খনিতে ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে মালিকের আদেশে শ্রমিকদের ওপরে পুলিশের গুলি চলে এবং লালবাজার খনিতে মাইনিং ইনচার্জ ব্রহ্মদেব শর্মা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মালিকবিরোধী বক্তব্য রেখে গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হন।[৬২]

কোলিয়ারি ট্রেড ইউনিয়নের সহসভাপতি ডোমন রায় ও সম্পাদক লালমোহন মাজি শ্রমিক ধাওড়াতে আক্রান্ত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আসানসোলের ১১টি শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক সংহতির নিদর্শন রেখে যুক্ত বিবৃতি দিয়ে খনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবিকে সমর্থন জানায়। এর পরেও মিঠাপুর রতিবাটিতে মালিকরা বেআইনিভাবে শর্ত লংঘন করে শ্রমিক ছাঁটাই, বকেয়া বেতন না দেওয়ার মতো অন্যান্য বিষয়গুলি বজায় রাখেন। শ্রমিকরা ক্রমশ উপলব্ধি করে প্রচলিত পুঁজিবাদী কাঠামোয় সরকার মালিকশ্রেণির স্বার্থে চালিত হন। সে কারণে খাদ কাজোরার মতো খনি কোলিয়ারি মজদুর সভার ইউনিয়ন ভাবতে অস্বীকার করায় কর্তৃপক্ষ খনি বন্ধ করেন এবং অন্যদিকে জমিদারি দখল বিলের আওতায় খনি মালিকদের মধ্যস্বত্ব দখলের বিনিময়ে সরকার ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করে।[৬৩] পূর্বোক্ত উপন্যাসে মাধবপুরের ম্যানেজার সেই কারণেই বলেন, ‘‘যে সরকার আমাদের পক্ষে আইন করবে না, আইন পাল্টাবে না, সেই সরকারকে আমরা গদিতে থাকতে দেব কেন? ওদের পেছনে পয়সা ঢালছি কি শুধু প্রেমে পড়ে?’’[৬৪] সমসাময়িক খনির এই সাহিত্যিক দলিল থেকে সরকার ও খনি মালিক আঁতাত অনেইটাই স্পষ্ট হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে এইজোট হয়ে ওঠেন।

খনি শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা কিন্তু একরৈখিকভাবে তৈরি হয় নি। প্রথম থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত শ্রমিকদের শ্রেণিগত ভিত্তিতে সঙ্গবদ্ধ করার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন। খনি শ্রমিকরা খনি ও ধাওড়াগুলিতে দীপেশ চক্রবর্তী উল্লিখিত প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর দ্বারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হতেন---যা শুরুতে তাদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করত।[৬৫] কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিজেদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা ক্রমশ উপলব্ধি করেন তাঁদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলের বাইরে খনির নিচে সকলেই চরম অবহেলিত, শোষিত খাদান মজদুর। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তারা অর্থনৈতিক দাবি পূরণের সঙ্গে সামাজিক ও

রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রেণি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমশ 'মে দিবস', 'লেনিন দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক তাদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় ভাবনা ও জাতিগত পরিচয়ের বাইরে এক ধরনের স্বতন্ত্র পরিচিতি গঠনের দিকে অগ্রসর হন। এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ ও নিজস্ব অবস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শ্রমিকরা শ্রেণিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী রূপে নিজেদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। শ্রমিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ও ভবিষ্যতে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার লড়াইয়ের দিনগুলিতে মেহনতি মানুষদের নিজস্ব উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়নগুলি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করে মজুমদার ট্রাইবুনালের অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টার মুখেও শ্রমিক ঐক্য অটুট থাকে। ১৯৫৭ সালের ২৯ জানুয়ারি শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম বৃদ্ধি পেলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট (১৯৬৭) গঠিত হলেও শ্রমিকদের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা সঞ্চারিত হয়। এই সময় 'দুলাবে' শুনতে পেল সরকার পুলিশকে মানা করে দিয়েছে-- মালিক ও শ্রমিকের সংগ্রামে নাক গলাতে। দশ বারো জন শ্রমিক একদিন দুলারের কাছে আসে এবং বলে আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে। শ্রমিকরা মানসিকভাবে তৈরি। সবাইকে নিয়ে দুলারে রবীন চ্যাটার্জির কাছে গেল। কথা হল, আগামী শনিবার দশ-বারো জন শ্রমিক দুলারের নেতৃত্বে যাবে খনিমুখে। সেইভাবে কর্মসূচি ঠিক হলে আগের দিন সবাই কাঁকড়াভাঙা গ্রামে চলে গেল। পরের দিন সকালে দুলারে সবাইকে সঙ্গে করে অমৃতনগর কোলিয়ারির দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু ম্যানেজার বিপদ বুঝেই পালিয়ে যায়।... তারপর সবাই দৌড়ে গৌরীপুর ক্যাম্পে চলে গেল। গেটের তালা ভেঙে গেল। চৈতি, শিবা, বীরা, পচাশিয়া, রামহরণ সিংহকে শ্রমিক-পাওনা মিটিয়ে দিতে শুরু করে।" [৬৭]

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার পর নতুন নতুন কোলিয়ারিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই সময় কোলিয়ারি অঞ্চলে কল্যাণ রায়, রবিন চ্যাটার্জি, নবকুমার মিশ্র, টি এন শুক্লা, সুনীল বসু রায়, রাজনারায়ণ সিং প্রমুখ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতেন। রাজনৈতিক উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে শ্রমিক শোষণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক আন্দোলনেরও মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের ফলে কিছু কোলিয়ারির জাতীয়করণ হলেও শ্রমিক আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং উত্তেজনা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কয়লাখনি শ্রমিকরা দাবি আদায়ে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দ মজদুর সভা, এ.আই.টি.ইউ.সি ও আই.এন.টি.ইউ.সি ১২ জুন থেকে রানিগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনিগুলিতে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হিন্দ মজদুর সভা ও আই.এন.টি.ইউ.সি. প্রতিনিধিরা ধর্মঘটের জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অনুরোধে কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘট তখনকার মতো স্থগিত রাখা হলেও পরবর্তীকালে ১৭ জুন ত্রিদলীয় সভা ডাকেন। দ্বিতীয় বৈঠকে ২৪ জুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মালিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলি যেমন, ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন, এবং ইন্ডিয়ার কোলিয়ারি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন---২ টাকা ১৩ পয়সা হিসেবে মহার্ঘ ভাতা ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে দিতে স্বীকৃত হয়। তৃতীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী খালিদ করের উপস্থিতিতে বন্ধ কারখানা খোলা ও মালিকরা যাতে বকেয়া অর্থ প্রদান করে সে ব্যাপারে চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে কয়লাখনি জাতীয়করণের দাবি জোরালো হতে থাকে।

তবে কতকগুলি সমস্যাও বাধার জন্য সংগঠিত আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সমস্যাগুলি হল---প্রথমত, ইউনিয়ন সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সমঝোতার সংস্কৃতি; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের মধ্যে সমতার অভাব ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা, উপার্জন ও মর্যাদার পার্থক্যের প্রবল্য; তৃতীয়ত, 'Sons of the

Soil' সেন্টিমেন্ট এখানে প্রবল; চতুর্থত, অশিক্ষা এবং সেই সংক্রান্ত দুর্নীতি জড়িত রাজনীতি; পঞ্চমত, এই শিল্পের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভিন্নভাষী এবং এদের ব্যাপক অংশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব; ষষ্ঠত, এখানে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন ছিল অনেকটাই আর্থিক দাবি দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সপ্তম সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত অবক্ষয় এবং এই জায়গায় অন্দোলন বিমুখতা; অষ্টমত, ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঝোঁক ব্যাপকভাবে রয়েছে। নবমত, একই ব্যক্তি পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, বহু গণসংগঠন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকে। এই ঝোঁক নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল আছে। পাশাপাশি নেতৃত্বের মধ্য দক্ষ, যোগ্য কর্মীর অভাবও পরিলক্ষিত হয়। দশমত, ঠিকাদারি ব্যবস্থার প্রভাব---যা শ্রেণি বিভাজনে, খনি শ্রমিকদের অন্দোলনের পরিপন্থী; একাদশত, মহাজনি বা সুদ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফাঁদে শ্রমিকদের জড়িয়ে পড়া; দ্বাদশত, আন্দোলনবিমুখতা ও নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ না থাকার বিষয়; ত্রয়োদশতম, শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের মাত্রাতিরিক্ত অভ্যাস এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সর্বক্ষণের কর্মী সংখ্যার অভাব। চতুর্দশতম, পার্টি নেতৃত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ। আবার শ্রমিকদের মধ্যে নানাবিধ দ্বন্দ্ব এবং অনৈক্য। যেমন ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ঠিকা শ্রমিক-স্থায়ী শ্রমিক দ্বন্দ্ব, পিস রোটেড ও টাইম রোটেড শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব। অফিসিয়াল কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের সুবিধাভোগী মনোভাব।

বর্ধমান জেলায় কয়লা শ্রমিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সচেতন শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের শ্রমিকশ্রেণিকে শ্রেণি-রাজনীতিতে সংগঠিত করতে সাহায্য করে যে ধরনের সংগঠিত পরিকল্পিত ও শক্তিশালী আন্দোলন প্রয়োজন, প্রথমদিকে তা বিকশিত হয় নি। এর পিছনে বিভিন্ন কারণগুলির অন্যতম ছিল সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্রাম ও শহরের অসাম্য, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের অত্যাচার উৎপীড়ণ প্রভৃতি বিষয়গুলি কয়লাশিল্প, শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ দানা বেঁধেছিল এবং একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। এই সময়কালে পাট, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিবহন শিল্পে শ্রমিকরা যেভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল এবং তাদের পেশাগত অধিকার অর্জনের সংগ্রাম শুরু করেছিল কয়লাখনি শ্রমিকদের সেভাবে সংগঠিত আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমলগ্নে কয়লাখনি শ্রমিকরা সচেতনভাবে সঙ্ঘের মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শ্রমিক্রা কম বেতন, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি, গ্রাচুইটি প্রথার প্রবর্তন, শ্রমিক ছাঁটাই, কাজে নিরাপত্তার অভাব, ঠিকাদারি ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত জলের অ-ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রমিকদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন শ্রম শোষণকে প্রতিরোধকল্পে এই ক্ষোভ সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেছিল। অনেক সময় খনি কর্তৃপক্ষ ও ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের আঘাত সংগঠিত হলেও শ্রমিকরা তাদের দাবি থেকে বিচ্যুত হয়নি। আবার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আন্তর্বিরোধ থাকলেও শ্রমিকদের অংশগ্রহণে আন্দোলন নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছিল। খনি মালিকপক্ষের নির্মম শোষণ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত করে, এর ফলে শ্রমিকরা নিজেদের পরিমণ্ডলের গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যান্য শিল্পের শোষিত শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কোথাও আবার কৃষকরা ও গ্রামবাসীরা কয়লাখনি শিল্পের শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। কারণ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থাকলে জমির নায্য দাম পাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যেত। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পালাবদল ঘটলেও কয়লাখনি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। তাই শ্রমিক্রা উপলব্ধি করে রাজনৈতিক আন্দোলনই শোষণ থেকে মুক্তির একমাত্র বিকল্পপথ। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের পরিচালনায় কয়লাখনির শ্রমিকশ্রেণি স্বতঃস্ফূর্ত ও জোরালো ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে---যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ।

তথ্যসূত্র:

১। লেনিন, ভি আই, অন ট্রেড ইউনিওন, মস্কো, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭০, পৃ. ৫
২। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, কয়লাশিল্পের শ্রমিক আন্দোলন, আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), আসানসোলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
৩। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-৬৩
৪। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৫। বসুরায়, সুনীল, রানীগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিক, মজুমদার দিব্যজ্যোতি (সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩, পৃ. ৭৬
৬। ঐ
৭। দাশগুপ্ত, প্রিয়ব্রত, বর্ধমান জেলায় কয়লাশিল্পের বিকাশের ধারা, দাস চান্দল্য, হাজরা, তারাপদ সম্পাদিত, কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত, বর্ধমান, প্রান্তর, ২০০৮, পৃ. ৪৯
৮। দাশগুপ্ত, রণজিৎ, শ্রমিক ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ধারা, নির্বাণ বসু, সম্পাদনা, অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু যৌথ উদ্যোগ, ২০১৩, পৃ. ৮,৯
৯। দাসগুপ্ত রণজিৎ, লেবার ইন ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, স্টাডিজ ইন কলোনিয়াল হিস্ট্রি, ক্যালকাটা, ১৯৯৪, পৃ. XVI
১০। বসুরায়, সুনীল, প্রাগুক্ত, মজুমদার দিব্যজ্যোতি সম্পাদনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১১। সেন, সুকোমল, ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইন্ডিয়া, হিস্ট্রি অফ ইমারজেন্স অ্যান্ড মুভমেন্ট, ১৯৩০-১৯৭০, ক্যালকাটা, পৃ. ২৪১
১২। সেন, সুকোমল, বাংলায় শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম—সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১০
১৩। চৌধুরী, বিবেক, সুনীল বসুরায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন, বর্ধমান, ২০০৩, পৃ. ২৪
১৪। রায়, রত্না, রজত রায়, ইউরোপিয়ান মনোপলি কর্পোরাশনস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রেনারশিপ, ১৯১৩-১৯২২ : আরলি পলিটিক্স অফ কোল ইন ইস্টরার্ন ইন্ডিয়া, ইকোনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, মে, ১৯৭১, পৃ. ৫৫
১৫। দ্য রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন ইন্ড্রস্ট্রিয়াল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল, ১৯২১, পৃ. ১২
১৬। রায়, রত্না, রজত রায়, প্রাগুক্ত, ইকোনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, মে, ১৯৭৪, পৃ. ৫৫
১৭। আই.বি. ফাইল নং ৯৯/২২, সাবজেক্ট, দ্য এনমিও মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯২২
১৮। আই.বি. ফাইল নং ১২৩/২৩, সাবজেক্ট, লিস্ট অব লেবার অ্যাসোসিয়েশন্ অ্যান্ড ইউনিয়নস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৩২
১৯। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
২০। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
২১। অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইনস ইন্ডিয়া, অব দ্য ইয়ার এন্ডিং ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৪২, দিল্লি ম্যানেজার অফ পাবলিকেশন গর্ভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস, কলকাতা, ১৯৪২, পৃ. ২০
২২। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
২৩। সেন, সুকোমল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৭১-৭৮, ২১২
২৪। দাশগুপ্ত, পরিমল, রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের শ্রমিক আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১
২৫। মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুক্ত; আচার্য, নন্দদুলাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০
২৬। নন্দা, গোপাল, অগ্নিযুগের রানীগঞ্জ, ১৯৯৭, পৃ. ৩১

২৭। মিত্র, ইরা, অবিভক্ত বাংলার শ্রমিকনেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর স্মৃতিচারণা, সম্পাদনা, বসু, নির্বাণ, অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ সেতু যৌথ উদ্যোগ, ২০১৩, পৃ. ৮৭
২৮। শাহেদুল্লা, সৈয়দ, বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, নতুন চিঠি প্রকাশনা, ১৯৯১, পৃ. ১৫১
২৯। নন্দা; গোপাল, প্রাগুক্ত, ১৯৯৭, পৃ. ৩১
৩০। মুখোপাধ্যায়, সরোজ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১৯৩০-১৯৪১, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, ১৯৮৫, পৃ. ৬৬
৩১। মিত্র, ইরা, প্রাগুক্ত, সম্পাদনা, বসু, নির্বাণ, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ৮৮
৩২। শাহেদুল্লা, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ. ১৫২
৩৩। ঐ, পৃ. ১৬১
৩৪। ঐ, পৃ. ১৬২
৩৫। ঐ, পৃ. ১৬৪
৩৬। ঐ, পৃ. ১৬৬
৩৭। মুখার্জি, বামাপদ, আসানসোল মহকুমার পাঁচ দশকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস; বার্ণপুর, ২০০৪, পৃ. ১০
৩৮। যশ, সর্বজিৎ, বর্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চলের ইতিহাস, সম্পাদনা ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪১৪
৩৯। ঐ, পৃ. ৪১৪-৪১৫
৪০। ঐ, পৃ. ৪১৫
৪১। আই.বি. ফাইল নং ৬৭১/৪৮, সাবজেক্ট, সুনীল বসুরায়
৪২। যশ, সর্বজিৎ, প্রাগুক্ত, সম্পাদনাঃ ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী, প্রাগুক্ত, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪১৫
৪৩। চ্যাটার্জি, গৌরাঙ্গ, কয়লাশিল্পের ইতিকথা—বর্ধমান জেলা, সম্পাদনাঃ ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী, প্রাগুক্ত, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪২৬
৪৪। আই.বি. ফাইল নং ২০৯৩/৪৮, সাবজেক্ট, হিন্দু মজদুর সভা
৪৫। প্রাগুক্ত
৪৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ৩
৪৭। আই.বি. ফাইল নং ২০৯ ৩/৪৮, প্রাগুক্ত
৪৮। আই.বি. ফাইল নং ৬৫-১৭, ব্রাঞ্চ, কমার্স, লেবার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, বি প্রসিডিংস, ডিসেম্বর, ১৯৪৭
৪৯। হবস্‌বম; এরিখ, দ্য এজ অফ দ্য এক্সট্রিমস, ১৯১৪-১৯৯১, লন্ডন, আবাকাস, ২০১২, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮
৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র, কয়লাকুঠির সেকাল-একাল, দাস চান্দল্য সোমনাথ, হাজরা, তারাপদ, সম্পাদিত কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত, বর্ধমান, পান্তর, ২০০৮, পৃ. ৬২
৫১। মুখার্জি, বামাপদ, আসানসোল কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিছু কথা, বর্ধমান, নতুন চিঠি প্রকাশনা, ২০১৫, পৃ. ২০
৫২। সিংহ, প্রফুল্লকুমার, অনার্স দামোদর, চিরায়ত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫
৫৩। ঐ, পৃ. ৮২

৫৪। সিংহ, প্রফুল্লকুমার, কয়লাকুঠির শ্রমিক আন্দোলন, দাস চান্দল্য সোমনাথ, হাজরা, তারাপদ, প্রাগুক্ত, ২০০৮, পৃ. ১০৭, স্বাধীনতা, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩, পৃ. ৩
৫৫। 'স্বাধীনতা', ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৩, পৃ. ৩
৫৬। রায়, দেবদত্ত, কালো হীরের দেশে, জ্ঞান প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯১
৫৭। স্বাধীনতা, ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৩, পৃ. ৪
৫৮। স্বাধীনতা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৫৪, পৃ. ৪
৫৯। 'নতুন চিঠি', ২৪ মার্চ, ১৯৫৫, পৃ. ১
৬০। রায়, দেবদত্ত, কালো হীরের দেশে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৬১। 'নতুন চিঠি', ২৪ মার্চ, ১৯৫৫, পৃ. ৩
৬২। 'নতুন চিঠি', ২৪ মার্চ, ১৯৫৫, পৃ. ৪
৬৩। 'স্বাধীনতা', ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৪, পৃ. ৩
৬৪। রায়, দেবদত্ত, কালো হীরের দেশে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৬৫। চক্রবর্তী, দীপেশ, রিথিঙ্কিং ক্লাস হিস্টরি, বেঙ্গ ১৮৯০-১৯৪০, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯
৬৬। সিংহ, প্রফুল্লকুমার, কয়লাকুঠির শ্রমিক আন্দোলন, দাস চান্দল্য সোমনাথ, হাজরা, তারাপদ, (স)., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭,
৬৭। 'নতুন চিঠি', শারদ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭